بسم الله الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ০৬ তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় আমি হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করছিলাম, যা সম্পূর্ণ হয় নি। তার সম্পর্কে আজ আরো কিছু ঘটনা ও রেওয়ায়েত উল্লেখ করছি। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের নির্দেশে তার মিত্র বনু কায়নুকা গোত্র যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের মতো হযরত উবাদা (রা.)-ও তাদের মিত্র ছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের জের হিসেবে সেই গোত্র থেকে তিনি পৃথক হয়ে যান এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর খাতিরে তিনি তাদের মিত্রতা থেকে নিজেকে পৃথক করে নেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (সূরা মায়েদা: ৫২)

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে-ই তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে নিশ্চয় তাদেরই গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালেম জাতিকে হেদায়েত দেন না।

(আল ইসাবাহ ফী তাময়িযিস্ সাহাবা লে-ইবনে হাজার আসকালানী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৬, উবাদা বিন সামেত, ২০০৫ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, এর অর্থ মোটেই এটি নয় যে, খ্রিষ্টান বা ইহুদির জন্য কোন উপকারী বা কল্যাণকর কথা কখনো বলা যাবে না বা তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা যাবে না, বরং এর অর্থ হলো, যেসব ইহুদি বা খ্রিষ্টান তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না। কেননা, অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না বা তোমাদেরকে ঘর থেকে বিতাড়িত করে নি তাদের সাথে সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে বারণ করেন না, তারা কাফের, ইহুদি বা খ্রিষ্টান যে-ই হোক না কেন। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (সূরা মুমতাহানা: ৯)

অর্থাৎ ধর্মীয় কারণে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বিতাড়িত করে নি তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন।

অতএব এখানে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে এবং প্রথমোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা দুর্বলতা, ভয় এবং হীনম্মন্যতার কারণে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রেখো না। উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তোমাদের তাওয়াক্কুল বা ভরসা থাকা উচিত আর তোমরা যদি নিজেদের ঈমানী অবস্থার উন্নয়ন সাধন কর তাহলে খোদা তা'লাও তোমাদের সাথে থাকবেন। কিন্তু আজকাল আমরা দেখি যে, দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম দেশগুলো সাহায্যের জন্য সেই অ-মুসলিমদের ক্রোড়েই গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে আর তাদেরকেই ভয় পায়। এর যে ফলাফল বের হয় তা হলো, প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্র অ-মুসলিমদের সাহায্য নিয়ে অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করে। এ অমুসলিমরাই ইসলামের গোড়া কর্তনের কারণ হচ্ছে। যাহোক, আমরা দোয়া করছি, এসব মুসলিম রাষ্ট্রকেও যেন আল্লাহ তা'লা সুমতি বা কাণ্ডজ্ঞান দান করেন। যাহোক, যে ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে তা হলো, বনু কায়নুকা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন তাদেরকে ঘেরাও করা হয় অতঃপর যুদ্ধ হয় এবং তারা পরাজিত হয়। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে সীরাত খাতামান্নাবিঈন (সা.) পুস্তকে উক্ত ঘটনার উল্লেখ যেভাবে করা হয়েছে তা হলো, সেই যুদ্ধের পর যখন তাদের অর্থাৎ বনু কায়নুকা-র পরাজয় হয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে দেশ ত্যাগের আদেশ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত ঘটনা হলো-

বদরের যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হয় এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় সংখ্যাস্বল্পতা এবং সহায়সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে কুরাইশের এক বিশাল সেনাদলের বিপক্ষে বিজয় দান করেন এবং মক্কার বড় বড় রথী-মহারথীরা ধুলোয় মিশে যায়, তখন মদিনার ইহুদিদের হৃদয়ে হিংসার সুপ্ত অগ্নি, যা লুক্কায়িত ছিল, দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। মুসলমানদের সাথে তারা প্রকাশ্যে তর্কাতর্কি আরম্ভ করে দেয় আর বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রকাশ্যে বলা শুরু করে যে, কুরাইশ সেনাদলকে পরাজিত করা এমন কী বড় বিষয় ছিল! আমাদের সাথে মুহাম্মদ (সা.)-এর মোকাবিলা হলে আমরা দেখিয়ে দিব যুদ্ধ কীভাবে করতে হয়। এমনকি এক সমাবেশে স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর মুখের ওপর তারা এ ধরনেরই বুলি আওড়ায়। অতএব রেওয়ায়েত রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের পর যখন মহানবী (সা.) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি (সা.) একদিন ইহুদিদেরকে একত্রিত করে নসীহত করেন এবং নিজ দাবি উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর (সা.) এই শান্তিপূর্ণ ও সহানুভূতিভরা বক্তব্যের বিপরীতে ইহুদি গোত্রাধিপতিরা যে ভাষায় জবাব দিয়েছিল তা হলো, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি সম্ভবত গুটিকতক কুরাইশকে হত্যা করে দাম্ভিক হয়ে উঠেছ। তারা ছিল রণকৌশল সম্বন্ধে অনবহিত। আমাদের সাথে যদি তোমাদের মোকাবিলা হয় তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে, যোদ্ধারা কেমন হয়ে থাকে। আর ইহুদিরা কেবল এই সাধারণ হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি বরং মনে হচ্ছিল যেন তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রও শুরু করে দিয়েছে। কেননা একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, সেই দিনগুলোতে একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী তালহা বিন বারাআ মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে ওসিয়্যত করেছিলেন যে, আমি যদি রাতে মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমার জানাযার জন্য রাতে যেন মহানবী (সা.)-কে সংবাদ দেয়া না হয় আর তার কারণ হলো কোথাও এমন যেন না হয় যে, আমার কারণে ইহুদিদের পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) কোন দুর্ঘটনা কবলিত হবেন। অর্থাৎ জানাযার জন্য তিনি (সা.) রাতে আগমন করবেন আর ইহুদিরা তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করার সুযোগ পাবে। যাহোক, বদরের যুদ্ধের পর

ইহুদিরা প্রকাশ্যে দুষ্কৃতির আশ্রয় নেয় আর যেহেতু মদিনার ইহুদিদের মাঝে বনু কায়নুকা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সাহসী ছিল, তাই সর্বপ্রথম তাদের পক্ষ থেকেই চুক্তি ভঙ্গ হয়। যেভাবে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মদিনার ইহুদিদের মাঝে সর্বপ্রথম বনু কায়নুকা সেই চুক্তি ভঙ্গ করে, যা তাদের ও মহানবী (সা.)-এর মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল আর বদরের পর তারা বেপরোয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করে এবং প্রকাশ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ করে আর সন্ধি ও চুক্তি ভঙ্গ করে।

কিন্তু এতসব কিছু সত্ত্বেও মুসলমানরা নিজেদের মনিব মহানবী (সা.)-এর পথ-নির্দেশনা অনুযায়ী সকল পর্যায়েই ধৈর্য ধারণ করে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করে নি, বরং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে- ইহুদিদের সাথে সম্পাদিত উক্ত চুক্তিনামার পর মহানবী (সা.) ইহুদিদের মনস্তুষ্টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ, একবার এক মুসলিম এবং এক ইহুদির মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়। ইহুদি ব্যক্তি সকল নবীর ওপর হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। উক্ত সাহাবী এতে রাগান্বিত হন এবং সেই ইহুদির সাথে তিনি কিছুটা রূঢ় আচরণ করেন এবং বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। মহানবী (সা.) যখন উক্ত ঘটনা জানতে পারেন, তখন তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট হন এবং সেই সাহাবীকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করে বলেন, আল্লাহ্‌র রসূলদের পরস্পরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে বেড়ানো তোমার কাজ নয়? এরপর ক্ষেত্র বিশেষে তিনি (সা.) মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে সেই ইহুদির মনস্তুষ্টি করেন। কিন্তু এমন মনরক্ষামূলক আচরণ এবং নম্রতা ও মমতাপূর্ণ ব্যবহার সত্ত্বেও ইহুদিরা তাদের দুষ্কৃতির মাত্রা বাড়িয়েই যাচ্ছিল। অবশেষে ইহুদিদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধের কারণ সামনে আসে আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের মনে বা অন্তরে লুক্কায়িত যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছিল, তা বক্ষে সুপ্ত থাকে নি বরং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে আর তা এভাবে হয়েছে যে, বাজারে এক ইহুদির দোকানে একজন মুসলমান মহিলা কিছু সওদা ক্রয় করতে যান। তখন সেই দোকানেই বসে থাকা কিছু দুষ্কৃতকারী ইহুদি সেই মহিলাকে অত্যন্ত জঘন্যভাবে উত্যক্ত করে এবং সেই দোকানদার নিজে দুষ্কৃতিমূলকভাবে সেই মহিলার অজ্ঞাতে তার নিম্নাঙ্গের পরিচ্ছদের একটি প্রান্ত কাঁটা জাতীয় কিছু দ্বারা তার পিঠের কাপড়ের সাথে টানিয়ে দেয় (হয়ত হুক জাতীয় কিছু লাগানো ছিল অথবা কাটা জাতীয় কোন জিনিস পড়ে ছিল যার সাথে তার কাপড় আটকে দেয়)। তাদের বখাটে আচরণের ফলশ্রুতিতে সেই মহিলা যখন সেখান থেকে ফিরে আসতে উদ্যত হন তখন তার কাপড় খুলে যায় অর্থাৎ তিনি নগ্ন হয়ে পড়েন। এতে সেই ইহুদি দোকানদার এবং তার সাথীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। মুসলমান সেই মহিলা লজ্জায় চিৎকার করেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঘটনাক্রমে কোন এক মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেন এবং সেখানে দুই পক্ষের মাঝে লড়াই শুরু হয়ে যায় আর ইহুদি দোকানদার নিহত হয়, যার ফলে সেই মুসলমান ব্যক্তির ওপর চতুর্দিক থেকে তরবারির মাধ্যমে আক্রমণ করা হয় আর আত্মাভিমানী সেই মুসলমান সেখানেই লুটিয়ে পড়েন এবং এভাবে শাহাদত বরণ করেন বা নিহত হন। এ ঘটনা জানার পর মুসলমানদের মাঝেও জাতিগত আত্মভিমান জেগে উঠে, তাদের চোখে রক্ত নেমে আসে আর অপরদিকে যেসব ইহুদি এই ঘটনাকে যুদ্ধের অজুহাত বানাতে চাচ্ছিল তারাও দলবদ্ধ হয়ে যায় আর এক দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর মহানবী (সা.) বনু কায়নুকার নেতৃবৃন্দকে সমবেত করে বলেন- এমন আচরণ শোভনীয় নয়। এমন দুষ্কৃতি হতে তোমরা বিরত হও এবং খোদাকে ভয় কর। কিন্তু অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ এবং লজ্জিত হওয়া আর ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে

তারা অত্যন্ত দাম্ভিকতাপূর্ণ ও বিদ্রোহাত্মক উত্তর দেয় এবং সেই একই হুমকির পুনরাবৃত্তি করে বলে, বদরের বিজয়ের জন্য গর্বিত হয়ো না; আমাদের সাথে যুদ্ধ হলে বুঝবে যে, যোদ্ধারা এমনই হয়ে থাকে। যাহোক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) সাহাবীদের একটি দলকে সাথে নিয়ে বনু কায়নুকার দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়ার এটিই ছিল শেষ সুযোগ। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের নিয়ে সেখানে যান, তখন ইহুদিদের উচিত ছিল, তারা যেসব বাড়াবাড়ি করেছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং মিমাংসার হাত বাড়ানো। কিন্তু তারা এর বিপরীতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যাহোক, যুদ্ধের ঘোষণা হয়ে যায় আর ইসলাম এবং ইহুদি শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে বাইরে বেরিয়ে আসে। সেই যুগের নিয়মানুসারে যুদ্ধের একটি রীতি ছিল, নিজেদের দুর্গাভ্যন্তরে সুরক্ষিতভাবে অবস্থান গ্রহণ করা আর অপরদিকে প্রতিপক্ষ দুর্গ অবরোধ করে রাখতে। যারা আক্রমণ করত, তারা দুর্গ অবরোধ করত অর্থাৎ সেটিকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখত আর সময় সুযোগ মতো একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাত। এভাবে হয় অবরোধকারী দল দুর্গ দখল করা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে অবরোধ তুলে নিত; অর্থাৎ নিজেদের ঘেরাও তুলে নিয়ে চলে যেত আর এটিকে দুর্গের ভেতরে অবস্থানরত লোকদের অর্থাৎ অবরুদ্ধ লোকদের বিজয় মনে করা হতো। অথবা দুর্গের ভিতরে যারা আবদ্ধ অবস্থায় থাকত তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে দুর্গের দ্বার খুলে দিয়ে নিজেদেরকে বিজয়ীদের হতে সমর্পণ করত। বনু কায়নুকা এই রীতিই অবলম্বন করে এবং নিজেরা দুর্গ বন্ধ করে ভিতরে অবস্থান নেয়। মহানবী (সা.) তাদেরকে অবরোধ করেন, দুর্গের চুতর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেন আর লাগাতার ১৫ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ চলে। অবশেষে বনু কায়নুকার পুরো শক্তি যখন নিঃশেষ হয়ে তাদের দর্পচূর্ণ হয়ে যায়, তখন তারা এই শর্তে নিজেদের দুর্গের দ্বার খুলে দেয় যে, তাদের সহায়-সম্পত্তি মুসলমানদের হয়ে যাবে, কিন্তু তাদের প্রাণ ও তাদের পরিবার-পরিজনের ওপর মুসলমানদের কোন অধিকার থাকবে না। মহানবী (সা.) এই শর্ত মেনে নেন। কেননা মূসায়ী শরিয়ত অনুযায়ী যদিও এরা সবাই হত্যাযোগ্য ছিল; অর্থাৎ এমন পরিস্থিতিতে তওরাত, যা মূসায়ী শরিয়ত, সেটির ভাষ্য হলো−এদেরকে হত্যা করা হোক। আর চুক্তি অনুসারে তাদের জন্য মূসায়ী শরিয়তের সিদ্ধান্তই কার্যকর হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এটি সেই জাতির প্রথম অপরাধ ছিল এবং মহানবী (সা.)-এর দয়ালু ও কৃপাময় প্রকৃতির পক্ষে সেই চরম শাস্তির দিকে সূচনাতেই যাওয়া সম্ভব ছিল না, যা কি-না চূড়ান্ত প্রতিকার হয়ে থাকে। কিন্তু অপরদিকে এমন বিশ্বাসঘাতক এবং শত্রুভাবাপন্ন গোত্রের মদিনায় থাকাটাও নিজের আস্তিনে সাপ পুষে রাখার চেয়ে কোন অংশে কম বিপজ্জনক ছিল না; অর্থাৎ নিজের বগলে সাপ পুষে রাখা বা আস্তিনের নিচে সাপ পুষে রাখার মতো এক বিষয় ছিল। বিশেষত যখন কিনা অওস ও খাযরাজ গোত্রের একদল মুনাফিক আগে থেকেই মদিনায় উপস্থিত ছিল এবং বাহির থেকেও সমগ্র আরবের বিরোধিতা মুসলমানদের নাভিশ্বাস তুলে ছেড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.)-এর পক্ষে এই সিদ্ধান্ত দেয়াই সম্ভব ছিল যে, বনু কায়নুকা যেন মদিনা ছেড়ে চলে যায়। তাদের অপরাধের তুলনায় এবং সেই যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী এই শাস্তি নিতান্তই হালকা একটি শাস্তি ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে তাতে কেবল আত্মরক্ষার বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, মদিনার মুসলমানদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। নতুবা, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন যে, আরবের যাযাবর জাতিগুলোর কাছে এই স্থানান্তরিত হওয়াটা কোন বড় বিষয় ছিল না। তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত, হিজরত করতে থাকত। বিশেষত যখন কোন গোত্রের জমি-জমা ও বাগান ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি না থাকে; যেমন

কি-না বনু কায়নুকা'র ছিল না, অর্থাৎ তাদের স্থাবর সম্পত্তি ছিল না; উপরন্তু পুরো গোত্র শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে একস্থান ছেড়ে অন্যস্থানে গিয়ে বসতি স্থাপনের সুযোগ লাভ করে, তাই বনু কায়নুকা অতি স্বাচ্ছন্দ্যে মদিনা ছেড়ে সিরিয়ার দিকে চলে যায়। তাদের যাত্রার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও তদারকি ইত্যাদির দায়িত্ব মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবী উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করেন যিনি ছিলেন তাদের অন্যতম মিত্র; যার স্মৃতিচারণ এখন করা হচ্ছে। অতএব উবাদা বিন সামেত (রা.) কয়েক মঞ্জিল পর্যন্ত বনু কায়নুকা-র সাথে যান এবং তাদেরকে নিরাপদে সামনে এগিয়ে দিয়ে ফেরত আসেন। যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয় তা ছিল কেবল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কিংবা তাদের পেশাসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি। এগুলো ছাড়া তেমন কোন জিনিস যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে মুসলমানরা নেয় নি।

[সীরাত খাতামান্নাবিঈন (সা.), পৃ. ৪৫৮-৪৬০ দ্রষ্টব্য]

এই বিষয়ে সীরাতুল হালবিয়াতেও কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) নির্দেশ দেন, সেই ইহুদিদেরকে যেন মদিনা থেকে চিরকালের জন্য বহিষ্কার করে দেশান্তরী করা হয়। তাদের দেশান্তরের দায়িত্ব তিনি (সা.) হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর ওপর অর্পণ করেন এবং ইহুদিদেরকে তিনি মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তিন দিন সময় দেন। অতএব তিন দিন পর ইহুদিরা মদিনাকে বিদায় জানিয়ে চলে যায়। এর আগে ইহুদিরা হযরত উবাদা বিন সামেতের কাছে আবেদন করেছিল যে, তাদেরকে তিন দিনের যে সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে, তা যেন কিছুটা বাড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু হযরত উবাদা (রা.) বলেন- না, এক মিনিটও তোমাদের ছাড় দেয়া হবে না বা সময় বাড়ানো হবে না। এরপর হযরত উবাদা (রা.) নিজ তত্ত্বাবধানে তাদেরকে দেশান্তরিত করেন এবং তারা সিরিয়ার একটি গ্রামের খোলা ময়দানে বসবাস শুরু করে।

(আস্-সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭, দারুল কুতুবুল আলামিয়্যা বৈরুত থেকে ২০০২ সনে মুদ্রিত সংস্করণ)

হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) কর্তৃক আরও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর ব্যস্ততা অনেক বেশি ছিল, তাই মুহাজেরদের মধ্য থেকে কেউ যখন মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হতো, তখন তিনি (সা.) তাকে কুরআন শিখানোর জন্য এই বলে আমাদের মধ্য থেকে কারো ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন যে, তাকে নিয়ে যাও এবং কুরআন শিখাও আর পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাও প্রদান কর। তিনি (রা.) বলেন, একবার মহানবী (সা.) এক ব্যক্তির দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করেন। সেই ব্যক্তি আমার সাথে আমার ঘরেই থাকতো এবং আমি তাকে নিজ পরিবারের সাথে খাবার খাওয়াতাম এবং তাকে কুরআন শিখাতাম। সে যখন নিজ গৃহে ফিরে যাচ্ছিল তখন সে ভাবলো, তার ওপর আমার অধিকার বর্তায়, অর্থাৎ আমার গৃহে থাকার কারণে, এত সেবা করার কারণে এবং কুরআন শিখানোর কারণে তার ওপর আমার কিছু অধিকার বর্তায়। এ কারণে সে আমাকে একটি ধনুক উপহারস্বরূপ প্রদান করে (তির ধনুকের মধ্য হতে একটি ধনুক উপহার দেয়)। তিনি বলেন, সেটি এত উন্নত মানের ধনুক ছিল যে, এর চেয়ে ভালো কাঠ এবং নম্যতায় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ধনুক এর পূর্বে আমি কখনো দেখি নি। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হই এবং এটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই ব্যক্তি আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়ে গেছে, এটি সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি (সা.) বলেন, এটি তোমার দুই কাঁধের মাঝখানে একটি অঙ্গারস্বরূপ, যা তুমি ঝুলিয়েছো। অর্থাৎ, এই যে উপহার তুমি গ্রহণ করেছ, এটি সে এ কারণে

দিয়ে গেছে যে, তুমি তাকে কুরআন পড়িয়েছ আর এভাবে তুমি আগুন নিয়েছ যা নিজের কাঁধে ঝুলাচ্ছো।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৩, মুসনাদ উবাদা বিন সামেত, হাদীস নং- ২৩১৪৬, আলামুল কুতুব বৈরুত থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত সংস্করণ)

অপর এক রেওয়ায়েতে, হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি সুফ্‌ফাবাসীদের মধ্য থেকে কিছু লোককে কুরআন পড়িয়েছি এবং লিখতে শিখিয়েছি। এজন্য তাদের একজন উপহারস্বরূপ আমার কাছে একটি ধনুক প্রেরণ করে। আমি ভাবলাম, এটি তো কোন সম্পদ নয় আর কোন বস্তুও নয় কিংবা সোনা-রুপা আর অর্থকড়িও নয়। আমি এটি দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে তিরন্দাজি করব। এটি তো কেবল একটি ধনুক যা আমার কোন কাজে আসবে। কখনো যদি জিহাদের সুযোগ আসে, তখন তিরন্দাজির সুযোগ লাভ হবে আর আল্লাহ্‌র পথেই এটি ব্যবহৃত হবে। যাহোক তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বলেন- তুমি যদি আগুনের বেড়ি পরিধান করা পছন্দ কর, তাহলে তা গ্রহণ কর।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, হাদীস নং ২১৫৭)

অর্থাৎ তুমি যদি চাও যে, আগুনের একটি বেড়ি তোমার গলায় পরানো হোক তাহলে ঠিক আছে, তা নিয়ে নাও। এই দু'টি রেওয়ায়েত ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে আসলেও বর্ণনা দু'টি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। হাদীস বিশারদগণ এই রেওয়ায়েত থেকে যে ব্যাখ্যা করেন তা হলো, সেই ধনুকটি ছিল কুরআন পড়ানোর পারিশ্রমিক হিসেবে, যা মহানবী (সা.) অপছন্দ করেছেন। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে পবিত্র কুরআন পড়ানোকে যারা আয়ের উৎস বানিয়ে নেয় তাদের জন্যও এতে দিকনির্দেশনা রয়েছে।

হযরত রাশেদ বিন হুবায়েশ (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা মহানবী (সা.) হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর শুশ্রূষার জন্য তার কাছে যান যখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তোমরা কি জান আমার উম্মতের শহীদ কারা? মানুষ একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে। মহানবী (সা.) এসেছিলেন হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর শুশ্রূষার জন্য। সেখানে তিনি (সা.) বলেন, তোমাদের কি জানা আছে যে, আমার উম্মতের শহীদ কারা? মানুষ একে অপরের দিকে তাকাতে থাকলে হযরত উবাদা (রা.) তাদেরকে বলেন, আমাকে বসতে সাহায্য কর। সুতরাং মানুষ তাকে বসিয়ে দেয়। হযরত উবাদা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে, শহীদ কারা? যারা সাহসিকতা ও অবিচলতার সাথে লড়াই করে এবং পুণ্যের আশা রাখে তারা শহীদ। মহানবী (সা.) বলেন, শুধুমাত্র এতটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে তো আমার উম্মতে শহীদদের সংখ্যা স্বল্পই হলো। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়া শাহাদত, প্লেগের কারণে মৃত্যু বরণও শাহাদত, অর্থাৎ যখন মহামারির প্রাদুর্ভাব হয়, কোন মু'মিনও যদি তাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আর সে উত্তম মু'মিন হয়ে থাকে তাহলে তা শাহাদত। অতঃপর পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করাও শাহাদত বা শহীদ হওয়া আর পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করাও শাহাদত। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণে মৃত্যুবরণকারী মহিলাকে তার সন্তান নিজ হাতে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৯২, মুসনাদ রাশেদ বিন হুবায়েশ, আলামুল কুতুব বৈরুত থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত সংস্করণ)

অর্থাৎ এমন মহিলা যে সন্তান জন্মদানের সময় রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যুবরণ করে, এ সময়কালে রক্তক্ষরণের এই অবস্থা চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে, এ সময়ে এ কারণে বা দুর্বলতার

কারণে যদি মৃত্যুবরণ করে, অর্থাৎ সন্তান জন্মদানের কারণে যদি মারা যায়, তাহলে তাকেও তার সন্তান টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ সন্তানই তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে।

সহীহ বুখারীতে যে রেওয়ায়েত রয়েছে তা আমি উল্লেখ করেছি আর তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি রেওয়ায়েতও পাওয়া যায়, যা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তি শহীদ। প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণকারী, পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারী, পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী, মাটিতে চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারী আর আল্লাহ্র রাস্তায় শাহাদত বরণকারী।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার, হাদীস নং ২৮২৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জন্য প্লেগকেও একটি নিদর্শনরূপে উল্লেখ করা হয়েছিল। নিদর্শন হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী এবং সত্যিকার অর্থে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা প্লেগের আক্রমণের শিকার হবে না। এখানে চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সর্বত্র যদি এক মহামারি ছড়িয়ে থাকে এবং একজন মু'মিন তথা পূর্ণ মু'মিন ব্যক্তি যদি এই কারণে মারা যায়, তাহলে মহানবী (সা.) বলেছেন, সে শহীদ।

ইসমাইল বিন উবায়েদ আনসারী বর্ণনা করেন যে, হযরত উবাদা (রা.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-কে বলেন, হে আবু হুরায়রা! আপনি তখন আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন না যখন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলাম। আমরা তাঁর (সা.) হাতে এই শর্তে বয়আত করেছিলাম যে, আগ্রহে ও অনাগ্রহে তথা সর্বাবস্থায় আমরা তাঁর কথা শুনব ও মান্য করব; সচ্ছলতায় ও দারিদ্রে খরচ করাব, সৎকাজের আদেশ দিব এবং অসৎকাজ করতে বারণ করব, আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে সঠিক কথা বলব এবং এ বিষয়ে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভ্রুক্ষেপ করব না আর মহানবী (সা.)-এর মদিনা মুনাওয়ারায় শুভাগমনে তাঁকে সাহায্য করব এবং নিজ প্রাণ ও স্ত্রী-সন্তানের বিনিময়ে হলেও তাঁর (সা.) সুরক্ষা করব। এ সমস্ত শর্তে আমরা বয়আত করেছিলাম; যার বিনিময়ে আমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

অতএব এই ছিল মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আতের শর্ত যা মেনে আমরা বয়আত করেছিলাম। যে এটি ভঙ্গ করে সে নিজের ক্ষতি সাধন করে। যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূর্ণ করবে যা মেনে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বয়আত করেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা এই বয়আতের কারণে মহানবী (সা.) মাধ্যমে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) একবার হযরত উসমান গণি (রা.)-কে এক পত্রে লিখেন, হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) এর কারণে সিরিয়া ও সিরিয়াবাসীরা আমার বিপক্ষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এখন হয় আপনি উবাদাকে (রা.) আপনার কাছে ডেকে নিন অথবা আমিই তার ও সিরিয়ার মধ্য হতে সরে দাঁড়াই, অর্থাৎ আমি এখান থেকে চলে যাই। হযরত উসমান (রা.) লিখেন, আপনি হযরত উবাদা (রা.)-কে বাহনে চড়িয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় তার নিজ বাড়িতে পাঠিয়ে দিন। সুতরাং হযরত মুআবিয়া (রা.) তাকে পাঠিয়ে দেন এবং তিনি মদিনা মুনাওয়ারা পৌঁছে যান। হযরত উবাদা হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে তার বাড়িতে যান, যেখানে এক ব্যক্তি ব্যতিরেকে আর কেউ ছিল না, অর্থাৎ যিনি সাহাবীদের পেয়েছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে ঘরের একটি কোণায় বসা অবস্থায় পান। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) তার দিকে তাকান এবং বলেন, হে উবাদা বিন সামেত! আপনার এবং আমাদের মধ্যকার বিষয়টি কী? তখন হযরত উবাদা (রা.) মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার পর এমন

লোকেরা তোমাদের শাসক হবেন, যারা তোমাদের এমনসব কাজের সাথে পরিচয় করাবেন যেগুলোকে তোমরা অপছন্দ করবে এবং এমনসব কাজকে তোমাদের অপছন্দ করাবেন যেগুলোকে তোমরা ভালো মনে কর। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতা করে তার কোন আনুগত্য করা উচিত নয়। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করো না।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৪-৫৬৫, মুসনাদ উবাদা বিন সামেত , হাদীস নং ২৩১৪৯-২৩১৫০, আলামুল কুতুব বৈরুত থেকে ১৯৯৮ সনে মুদ্রিত সংস্করণ)

কিছু কিছু বিষয়ে মতানৈক্য হতে পারে। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) এবং হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) এর মাঝেও এ ধরনের কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতো। গত খুতবায়ও আমি এটি উল্লেখ করেছিলাম যে, হযরত উমর (রা.)-এর যুগেও একবার এমনটি হয়েছিল আর হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.) যেহেতু প্রাথমিক সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর বিভিন্ন ধরনের মাসলা মাসায়েল তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে সরাসরি শুনেছেন তাই তিনি এগুলোর ওপর খুব কঠোরভাবে নিজে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন এবং অন্যদেরও আমল করাতেন আর বলতেন যে, এটিই সঠিক। হযরত উমর (রা.)-এর যুগে যখন হযরত আমীর মুআবিয়ার সাথে তার অর্থাৎ হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.)-এর কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয় তখন হযরত উমর (রা.) হযরত আমীর মুআবিয়া (রা.)-কে বলেন, তুমি তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবে না, তিনি যেসব মাসায়েল (ধর্মীয় বিধি-নিষেধ) বর্ণনা করেন তা তাকে করতে দাও আর তিনি যখন মদিনায় আসলেন তখন তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

(সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুস্ সুন্নাহ, হাদীস-১৮)

কিন্তু হযরত উসমানের যুগে পুনরায় যখন এ বিষয়টি সামনে আসে, তখন হযরত উসমান (রা.) তাকে সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে ফিরিয়ে আনেন। মোটকথা হযরত উবাদা (রা.)–এর একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি বেশ কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। তিনি নিজে সেগুলো বুঝতেন। মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি শোনার কারণে তিনি কখনো দ্বিমত পোষণ করতেন আবার কিছু কিছু বিষয় বলেও দিতেন। যেমন লেনদেন, বিনিময় বা ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। যাহোক, এটি ব্যাপক একটি বিষয় যা এখন এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে এ বিষয় নিয়েও তার মতবিরোধ হয়েছিল। যাহোক, তার কাছে কিছু যুক্তি-প্রমাণ ছিল আর তিনি সে অনুযায়ী নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আর আমীর মুআবিয়া (রা.) নিজস্ব ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। কিন্তু কুরআন-হাদীসের বর্ণনা এবং বর্তমান যুগে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বর্ণনা থেকে প্রাপ্ত স্পষ্ট দলিল প্রমাণ ব্যতীত এভাবে মতবিরোধ করে বেড়ানো সবার কাজ নয়। মনে রাখতে হবে, নীতিগত একান্ত জরুরী বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না, তার মাঝেই থাকতে হবে। অতএব এটিই প্রত্যেক আহমদীর নিজ দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। সেইসাথে আনুগত্যের গণ্ডিতেও থাকতে হবে।

হযরত আতা বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর পুত্র ওয়ালিদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনার পিতা অর্থাৎ হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর মৃত্যুকালে ওসীয়্যত কী ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি অর্থাৎ হযরত উবাদা (রা.) আমাকে ডেকে বলেন- হে আমার পুত্র! খোদা তা'লাকে ভয় কর আর জেনে রাখ যে, তুমি ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বন করতে পারবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান আনবে, অর্থাৎ ঈমান পরিপূর্ণ হওয়া উচিত, আর অদৃষ্টের

ভালোমন্দের প্রতি ঈমান আনবে। সুতরাং তুমি যদি এগুলো ছাড়া অন্য কোন বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ কর তাহলে তুমি আগুনে প্রবেশ করবে।

(সুনান আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল কদর, হাদীস নং- ২১৫৫)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা.) এর ঘরে আসতেন, যিনি হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁকে (সা.) খাবার খাওয়াতেন। একবার মহানবী (সা.) হযরত উম্মে হারাম (রা.) এর গৃহে আসলে তিনি তাঁকে (সা.) আহার করান এবং মহানবী (সা.)-এর মাথা দেখতে শুরু করেন ও মাথায় বিলি কাটতে আরম্ভ করেন। এতে মহানবী (সা.) ঘুমিয়ে পড়েন। এরপর মুচকি হাসির সাথে ঘুম থেকে জাগ্রত হন। হযরত উম্মে হারাম (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী কারণে মুচকি হাসছেন? তিনি (সা.) বলেন, আমার উম্মতের এমন কিছু মানুষকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয় যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য বের হয়েছে। সামুদ্রিক সফর তারা এমন অবস্থায় করছে যেন তারা সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদশাহ। মতান্তরে তিনি বলেন, সেসসব বাদশাহর ন্যায়, যারা সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছে। কোন শব্দ তিনি (সা.) বলেছিলেন সে বিষয়ে বর্ণনাকারী নিশ্চিত ছিলেন না। যাহোক, হযরত উম্মে হারাম (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। মহানবী (সা.) হযরত উম্মে হারাম (রা.)-এর জন্য দোয়া করেন। এরপর মহানবী (সা.) বালিশে নিজের মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি (সা.) আবার মুচকি হাসির সাথে জাগ্রত হন। উম্মে হারাম বলেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী কারণে মুচকি হাসছেন? তিনি (সা.) বলেন, আমার উম্মতের কিছু মানুষকে আমার সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধের জন্য বের হয়েছে। এরপর তিনি (সা.) প্রথমোক্ত কথা, যা এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি করেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি (সা.) বলেন, তুমি তো পূর্বেই তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছ। হযরত উম্মে হারাম (রা.) মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এর যুগে সামুদ্রিক সফরে অংশ নেন এবং যখন তীরে আসেন, তখন নিজ বাহন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্‌ সিয়ার, হাদীস নং: ২৭৮৮-২৭৮৯)

মহানবী (সা.) উম্মে হারাম (রা.)-এর ঘরে যেতেন। কেননা তার সাথে মহানবী (সা.)-এর মাহরাম সম্পর্ক ছিল। এমন নয় যে, তিনি (সা.) পরস্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, উম্মে হারাম (রা.) মিলহান ইবনে খালেদ এর মেয়ে। তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত আনাস (রা.)-এর খালা ছিলেন এবং তার মা ছিলেন উম্মে সুলায়েমের বোন। তারা উভয়ে অর্থাৎ উম্মে হারাম এবং উম্মে সুলায়েম দুধের সম্পর্কের দিক থেকে বা কোন আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর খালা ছিলেন।

(আল ইসতিয়াব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯৩১, দারুল জিল বৈরুত থেকে ১৯৯২ সনে মুদ্রিত সংস্করণ)

ইমাম নববী লিখেছেন, সব আলেমের ঐকমত্য হলো, উম্মে হারাম (রা.) মহানবী (সা.)-এর মাহরাম ছিলেন (অর্থাৎ যার সাথে বিবাহ অবৈধ)। তাই মহানবী (সা.) অকৃত্রিমভাবে কখনো কখনো দুপুর বেলা তার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন। কিন্তু কীভাবে মাহরাম ছিলেন সেটি নিয়ে

মতভেদ রয়েছে। মাহরাম যে ছিলেন- একথা সবাই মানে কিন্তু সম্পর্কের দিক থেকে কোন ধরনের মাহরাম ছিলেন, এটি নিয়ে কেউ কেউ মতভেদ করেছেন।

(ইমাম নববী রচিত আল মিনহাজ বাশর্‌হে সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারা, হাদীস নং- ১৯১২, ২০০২ সনে বৈরুতে মুদ্রিত)

যাহোক, কেউ কোন সম্পর্কের দিক থেকে মাহরাম বলেছেন আবার কেউ ভিন্ন সম্পর্কের দিক থেকে। হযরত উম্মে হারাম (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করেন আর হযরত উসমান যুন্নুরাইন এর যুগে তিনি তার স্বামী উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর সাথে (যিনি আনসারদের মধ্যে হতে খুব সম্মানিত একজন সাহাবী ছিলেন, যার স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে,) আল্লাহ্‌র পথে তার সাথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হন এবং রোম সাম্রাজ্যে পৌঁছে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। মহানবী (সা.) যে রুইয়া (সত্য স্বপ্ন) দেখেছিলেন, তদনুযায়ীই তার শাহাদত হয়।

বুখারীর ব্যাখ্যা ‘উমদাতুল ক্বারী’ এবং বুখারীর আরেকটি ব্যাখ্যা ‘ইরশাদুস সারী’তে লেখা আছে যে, হযরত উম্মে হারাম (রা.)-এর মৃত্যু ২৭ থেকে ২৮ হিজরীতে হয়েছে। কারো কারো মতে তাঁর ইন্তেকাল আমীর মুআবিয়ার শাসনামলে হয়েছিল। প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ আর তার জীবনী রচয়িতাগণও সেটিই বর্ণনা করেছেন যে, সামুদ্রিক যে যুদ্ধে হযরত উম্মে হারাম ইন্তেকাল করেছেন তা হযরত উসমানের খিলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিল। মুআবিয়ার যুগ বলতে হযরত মুআবিয়ার শাসনকাল বুঝায় না, বরং এর দ্বারা সেই সময়কে বুঝানো হয়েছে যখন হযরত মুআবিয়া (রা.) রোমের বিরুদ্ধে একটি সামুদ্রিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে হযরত উম্মে হারাম (রা.)ও তার স্বামী হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সামুদ্রিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথেই হযরত উম্মে হারাম ইন্তেকাল করেছিলেন। আর এই ঘটনা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ঘটেছিল।

(উমাদাতুল ক্বারী, শারহে সহীহ বুখারী, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ১২৮, দ্বারো আহইয়াইত্ তুরাসিলিল আরবী কর্তৃক ২০০৩ সনে মুদ্রিত) (ইরশাদুস সারী, শারহে সহীহ বুখারী, লে-শিহাবুদ্দীন আল-কাসতালানী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩০, দ্বারুল ফিকর বৈরুত থেকে ২০১০ সনে মুদ্রিত সংস্করণ)

জুনাদাহ বিন আবু উমাইয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা যখন হযরত উবাদার নিকট যাই, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। আমরা বললাম, আল্লাহ্ তা’লা আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আপনি আমাদের কাছে কোন হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন, যেন আল্লাহ্ তা’লা আপনাকে কল্যাণ দান করেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আমাদেরকে ডাকেন আর আমরা তাঁর (সা.) হাতে বয়আত করি। যেসব কথা মানার শর্তে তিনি (সা.) আমাদের বয়আত গ্রহণ করেন, সেই বিষয়গুলো হলো- আমরা এই কথায় বয়আত গ্রহণ করছি যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, অভাব-অনটনে বা স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আমাদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রেও (আপনার কথা) শুনব আর আনুগত্য করব এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য শাসকদের সাথে লড়াই করব না, তবে প্রকাশ্য কুফর ব্যতিরেকে, যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ফিতন, হাদীস নং- ৭০৫৫-৭০৫৬)

অর্থাৎ সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে কুফরি করতে যদি বাধ্য করা হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও যথাযথ এখতিয়ার বা কর্তৃত্ব লাভ হলে তখন। সুনাবী বর্ণনা করেন, হযরত উবাদা বিন সামেত (রা.)-এর কাছে যখন যাই তখন তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ছিলেন। আমি কাঁদতে আরম্ভ

করলে তিনি বলেন, থাম, কাঁদছ কেন? আল্লাহ্‌র কসম! আমাকে যদি সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়, তাহলে আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করব এবং আমাকে যদি সুপারিশ করার আধিকার দেয়া হয় তবে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব আর আমার যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে আমি তোমার উপকার সাধন করব। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছ থেকে শোনা সেই সমস্ত হাদীসই আমি বর্ণনা করেছি, যেগুলোতে তোমাদের জন্য মঙ্গলের বাণী রয়েছে, শুধুমাত্র একটি হাদীস ব্যতিরেকে যা আজ মৃত্যুশয্যায় আমি তোমাদেরকে বলে যেতে চাই। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি (সা.) বলতেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে উপাসনার যোগ্য আর কোন সত্তা নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'লা আগুনকে হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি মুসলমান।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং ২৯)

আল্লাহ্ তা'লা এই সাহাবীদের মর্যাদা উন্নীত করুন, যারা এমনসব কথা আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন যা আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের জন্যও অত্যন্ত আবশ্যক।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই এবং তাদের জানাযার নামাযও পড়াব। এদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হলেন সাঈদ সূকিয়া সাহেব, যিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। গত ১৮ এপ্রিল তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সংবাদ বিলম্বে পৌঁছানোর কারণে তার জানাযাও দেরিতে পড়ানো হচ্ছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহূম সিরিয়া জামা'তের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং প্রবীণ সদস্যদের একজন ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন খতম করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি আরবি ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়ম সম্পর্কে ও শুদ্ধ ভাষায় কুরআন তিলাওয়াতে পারদর্শী ছিলেন। অধিকাংশ আহমদীদের তিনি কুরআন পাঠের সঠিক নিয়ম শিখাতেন। মোহতরম মুনীরুল হুসনি সাহেব তার ওপর অনেক ভরসা করতেন। তিনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করলেও উকিলের পেশা তার পছন্দ ছিল না। এজন্য তিনি শিক্ষকতার পেশা বেছে নেন এবং এরপর পুরো দেশে বিশিষ্ট শিক্ষকদের একজন বলে তাকে গণ্য করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি শিক্ষকতা করেছেন এবং হেডমাস্টারের পদ পর্যন্ত তার পদন্নোতি হয়। মরহুমের তবলীগ করার প্রবল স্পৃহা ছিল। সবাইকে তবলীগ করতেন। কয়েক বছর পূর্বে যখন আরবী ডেস্ক-এর পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তাকাদির অনুবাদ পুনঃমুদ্রণ করা হয়, তিনি সবগুলো পাঠ করেন। তিনি বলতেন, এত দীর্ঘকাল আহমদী থাকার পর এখন আমি জানতে পেরেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসলে কী বলে গেছেন। এখন প্রথমবারের মতো আমি জামা'তের গুরুত্ব অনুধাবন করছি। এখন আমি প্রকৃত ইসলাম-আহমদীয়াত সম্পর্কে নতুনভাবে জ্ঞান অর্জন করছি। তার উত্তম চরিত্র আর সামাজিকতা এবং উদারতা ও আত্মাভিমান আর আত্মসম্মানবোধ এবং কোন প্রতিদানের আশা ছাড়াই অন্যদের সাহায্য করার গুণাবলী সম্পর্কে তাকে যারা জানে তাদের সবাই উল্লেখ করেছে এবং তারা এতে বেশ প্রভাবিত ছিল। তার পরিচিত সবার তার এসব গুণাবলীর কারণেই তার প্রতি ভালোবাসা ছিল। তিনি নিজের কাজে মগ্ন থাকতেন। সর্বদা হাসিমুখে থাকতেন। স্নেহপ্রবন পিতা এবং নিষ্ঠাবান স্বামী ছিলেন। তার বন্ধুত্বের গণ্ডি অনেক প্রসারিত ছিল। নামায এবং ইবাদতে নিয়মিত ছিলেন। যখনই কোন অর্থ পেতেন, তা

থেকে চাঁদা আদায় করতেন। অনেক সময় নিজের পুরো টাকাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিতেন। তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবারে তিন পুত্র এবং তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ সাহেব এবং কনিষ্ঠ পুত্র জালাল উদ্দিন সাহেব আহমদী। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা এবং ক্ষমার আচরণ করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার সন্তানদের পক্ষে তার দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন এবং অন্য সন্তানদেরও সত্য চেনার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, তিউনিসিয়ার মোকাররম আত্তৈয়্যব আল উবায়দি সাহেবের। গত ২৬ জুন তারিখে ৭০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি নিজ গ্রামে একমাত্র আহমদী ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং জামা'ত ও যুগ ইমামের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী আর খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের প্রায় পুরো জীবন বিভিন্ন মসজিদে অতিবাহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রেমিক ছিলেন। অনেক বেশি যিকরে ইলাহীতে রত থাকতেন। জামা'ত সম্পর্কে জানার পর কালবিলম্ব না করে কেন্দ্রে পৌঁছেন এবং তৎক্ষণাৎ বয়আত করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কবিতার প্রেমিক ছিলেন। জুমুআর নামায আদায়ের জন্য প্রায় পাঁচ ঘন্টা রেল গাড়িতে সফর করে কেন্দ্রে যেতেন। অনেক সাহসী মানুষ ছিলেন। যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো তাকে আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত করাতেন। নিজের পরিবার এবং সমাজের পক্ষ থেকে তার ওপর অনেক চাপ ছিল। কিন্তু তিনি তার ঈমানে দৃঢ়চিত্ত থাকেন। বয়আতের প্রথম দিনেই মন খুলে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। তিনি যখন ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারেন তখন সাথে সাথেই ওসীয়্যত করেন। যুবকদের আর্থিক কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ করতেন আর বলতেন, আর্থিক কুরবানীর কল্যাণে আমার ধনসম্পদে অনেক বরকত সৃষ্টি হয়েছে। মরহুম বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করারও তৌফিক লাভ করেছেন। জামা'ত এবং খিলাফতের প্রেমিক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিও কৃপা এবং মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন আর তার দোয়া এবং নেক ইচ্ছা সমূহ তার সন্তানসন্ততি ও নিকটাত্মীয়ের পক্ষে গ্রহণ করুন।

তৃতীয় জানাযা হলো, শ্রদ্ধেয়া আমাতুশ্ শকুর সাহেবার, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সবচেয়ে বড় কন্যা ছিলেন। তিনি গত ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে ৭৯ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কন্যা ছিলেন। এদিক থেকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পৌত্রি ছিলেন আর নানা-বাড়ির দিক থেকে হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) এবং হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব (রা.)-এর দৌহিত্রী ছিলেন। ১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে তিনি কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে গ্রহণ করেন। এরপর লাহোর থেকে বিএড করেন। তার দু'বিয়ে হয়। প্রথমে তার বিয়ে হয়েছিল নবাব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের পুত্র শাহেদ খান সাহেবের সাথে। এই ঘরে তার সন্তানদের মধ্যে রয়েছে দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। তার এক ছেলে আমের আহমদ খান ওয়াকেফে জিন্দেগী এবং বর্তমানে তাহরীকে জাদীদে কাজ করছেন। বর্তমানে তার দু'জন দৌহিত্রও জামেয়াতে শিক্ষাগ্রহণ করছে। তার দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল ডাক্তার মির্যা লেইক সাহেবের সাথে। এই ঘরে কোন সন্তানাদি নেই। তিনি জামা'তের বড় কোন পদে খিদমতের সুযোগ পান নি বটে কিন্তু সাধারণভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে জামা'তের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা লাজনা ইমাইল্লাহ্র বিভিন্ন বিভাগে তার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। যারা তার সম্পর্কে লিখেছেন তাদের প্রত্যেকেই একথা লিখেছেন যে, গভীর সহযোগিতার প্রেরণা নিয়ে বিনীতভাবে তিনি

আমাদের সাথে কাজ করতেন। লেখাপড়ার কাজের প্রতিও তার আগ্রহ ছিল। তিনি হযরত আম্মাজানের জীবনচরিতও লিখেছেন। নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) সম্পর্কেও দ্বিতীয় আরেকটি পুস্তক "মোবারেকা কি কাহানী মোবারেকা কি যবানী" (অর্থাৎ মোবারেকা বেগমের ভাষায় মোবারেকার কাহিনী) লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি তৃতীয় একটি বইও রচনা করেন যার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছে কিন্তু পরিস্থিতির কারণে প্রকাশিত হয় নি, যা হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-এর সহধর্মিণী হযরত বু'যয়নব সাহেবা (রা.)-এর জীবনী ও জীবনচরিত সম্পর্কিত। যাহোক এ তিনটি পুস্তকই লাজনাদের জন্য খুবই ভালো সাহিত্য।

তার দৌহিত্রী মালাহাত বলেন, আমার নানী সর্বদা একথা বলতেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেছিলেন, সর্বদা হাসি মুখে থেকো, কেননা এটি সদকা-স্বরূপ। তিনি বলেন, তাই আমি তাকে দেখেছি, অন্তিম ব্যাধিতেও অন্যদের দিকে হাসিমুখে তাকাতেন আর কষ্টের মাঝেও তার মুখে হাসি লেগেই থাকতো। তার রোগ অনেক কষ্টদায়ক ছিল। শেষের দিকে জানা যায় যে, তার ক্যানসার হয়েছে, কিন্তু পরম ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবলের সাথে তিনি তা সহ্য করেছেন। একথা সর্বদা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রা.)-ও বলতেন যে, তিনি একান্ত ধৈর্যের সাথে সকল কষ্ট সহ্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মকেও সর্বদা খিলাফত ও জামা'তের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আরেকটি কথা রয়ে গেছে, আজ যেহেতু খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ইজতেমা আরম্ভ হচ্ছে তাই জুমুআর সাথে আসরের নামায জমা হবে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ. ৫-৯)
(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)